নৈঃশব্দের ভাষা

প্রবীর গুহ

শরীরের ভাষার ব্যবহারেই গড়ে ওঠে আমাদের থিয়েটার। এ জন্য একে বলা হয় 'ফিজিক্যাল থিয়েটার'—অনেকেই যাকে নেহাত ফর্মের এক 'বিদেশি চমক' বলে মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটাই থিয়েটারের আদি ফর্ম। গুহামানবের দল যখন অনুকরণ আর আদিম নৃত্যের মাধ্যমে বন্য প্রাণীদের সঙ্গে তাদের লড়াইকে বোঝাতে চাইত, থিয়েটারের সূচনা হয়েছে সেই পর্বেই। গোষ্ঠীজীবনের বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ যেমন শিকার, মাছ-ধরা, খাদ্য-সংগ্রহ, অভিষেক ও যুদ্ধ—ইত্যাদিকে ব্যক্ত করতে ব্যবহৃত হয়েছে এই থিয়েটার। পরবর্তীকালে বিভিন্ন লোকাচারের অনুষ্ঠানে এমনকি যাত্রাতেও এই ফিজিক্যাল ফর্মের নানা রূপ খুঁজে পাওয়া যাবে। এ কালেও যে কোনও রাজ্যের লোক-সংস্কৃতিতে ব্যাপকভাবে ফিজিক্যাল ফর্মের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। গ্রামের মানুষের কাছে ফিজিক্যালিটিই বিশ্বাসের মূল ভিত্তি গড়ে তোলে। লোক-সংস্কৃতিতে ফিজিক্যালিটির ব্যবহার কিন্তু এক-আধ দিনের চিন্তার ফল নয়, এর পেছনে রয়েছে কয়েক হাজার বছরের অনুশীলনের ইতিহাস।

শারীরিক কসরত নয়

এই ফিজিক্যাল থিয়েটার প্রকৃতপক্ষে কী? সেগুলো কি সত্যই কিছু শারীরিক কসরত দেখানো মাত্র? আসলে তা নয়! দর্শকের কাছে নিবেদন করার জন্য যখন আমাদের কাছে শরীর ছাড়া আর কিছুই থাকে না, সে ক্ষেত্রে শরীরের নানা বিভঙ্গ দিয়ে কখনও একক বা কখনও দলগতভাবে একটা শরীর-ভাষা তৈরি করে আমরা বক্তব্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করি, সংযোগ স্থাপন করতে চাই। এখন প্রশ্ন হল এই শরীর-ভাষা বলতে কী বোঝায় এবং কীভাবেই বা তার প্রকাশ ঘটে? সে ভাষাকে কি আমি নিজেই নিয়ন্ত্রণ করি? সহজভাবে বলতে গেলে পৃথিবীর সব দেশের মানুষই সাধারণত একইভাবে কাঁদে, হাসে, অভিমান করে, দুঃখ পায় বা রাগ করে। এ ধরনের আবেগের বহিঃপ্রকাশ সকলের ক্ষেত্রেই প্রায় এক রকম সুতরাং এগুলোকে কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কিন্তু কিছু অন্যধরনের বৈশিষ্ট্যও আছে যা সাধারণভাবে দৃষ্টিগোচর নয়। যেমন ক্ষুধার অভিব্যক্তি আমাদের চোখে-মুখে খুব কমই ফুটে ওঠে। কিন্তু খিদে পেলে এক-একজনের ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া হবে এক-এক রকমের। এখন অভিনয়ে 'খিদে' ব্যাপারটা আনতে গেলে আমরা কোনও সাধারণ রূপ খুঁজে পাব না,

আমাদের তখন ফিজিক্যালিটিতে বিশ্বাস করতে হয়। ক্ষুব্ধিত ব্যক্তির ভিতরে যা ঘটছে, তার ফিজিক্যাল রূপটা অভিনয়ের মধ্যে আনতে হয়। শরীরবিদ্যার ব্যাপারটা এখানে চলে আসে, অর্থাৎ মোটর নার্ভ, সেনসরি নার্ভ ইত্যাদি।

আমাদের বেশিরভাগ কাজ বা অভিব্যক্তির জন্য দায়ী স্নায়ুতন্ত্র বা নার্ভাস সিস্টেম। এখন এই নার্ভগুলোর উপরে যদি আমার এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ জন্মায়, অর্থাৎ কোনও নার্ভকে দিয়ে কোন সময়ে কতটুকু কাজ কীভাবে করাব—তা যদি আমার আয়ত্তাধীনে হয় তবেই আমি শারীরিক থিয়েটারের ভিত্তি খুঁজে পাব। পুরনো দিনের লোকশিল্পী বা বড় বড় শিল্পীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁরা কোনও-কোনও ক্ষেত্রে নিজেদের অজ্ঞাতসারে, অসচেতনভাবেই এই ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। আমরা সেই ঐতিহ্যের জগতে সন্ধান করে দেখতে চেষ্টা করি, আবিষ্কার করতে চাই সেই পদ্ধতি বা প্রক্রিয়াগুলো যার মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে পেশী এবং স্নায়ুতন্ত্রের উপর সচেতনভাবে খানিকটা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যাবে। জেনেবুঝে তাকে থিয়েটারের [শরীর-নির্ভর] কাজে লাগাতে পারব। [শারীরিক] থিয়েটারের এটাই পদ্ধতি। কিন্তু এই অবস্থাটা এখনও আমারা তৈরি করতে পারিনি, তাকে খোঁজার চেষ্টা করছি মাত্র।

ভাষা-সন্ধান

'কী বলব' এবং 'কীভাবে বলব' এই দুটিই থিয়েটারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। অর্থাৎ সাবজেকট ম্যাটার আর ফর্মের বিচার। 'কী বলব'-র ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই তাদের চিন্তা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে বিষয়কে বেছে নেবে। আমি এখানে 'কীভাবে বলব' বিষয়ে কয়েকটি কথা বলতে চাই। একটা উদাহরণ দিয়ে শুরু করা যাক। মনে করুন আপনি ভিড় বাসে জনৈক সহযাত্রীর পা মাড়িয়ে দিয়েছেন। এবারে একজন প্রাচ্যের অধিবাসী হিসাবে আপনি নিশ্চয়ই ক্ষমাপ্রার্থী হবেন। প্রথমেই আপনি ঠিক করে নিলেন 'কী বলব'। ধরা যাক, আপনি বলবেন, 'সরি, কিছু মনে করবেন না, দেখতে পাইনি'। এবারে প্রশ্ন, 'কী ভাবে বলবেন'। আপনার লজ্জিত অবস্থাকে প্রকাশ করতে প্রয়োজন হবে গলায় অতি বিনম্র সুর এবং বিনয়ীভাবের দ্যোতক দেহের অঙ্গভঙ্গি। এ দুয়ের মিশ্রণে উচ্চারিত হতে হবে আপনার বাক্যটিকে। তা না করে আপনি যদি বেশ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে বলেন, 'লেগে গেছে, ক্ষমা করবেন', বা ওই ধরনের কিছু, ভদ্রলোক কি তাহলে সত্যিই আপনাকে ক্ষমা করবেন?

এবার থিয়েটার থেকে দুয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক। বিখ্যাত 'কল্লোল' নাটকের কথা যখনই মনে পড়ে, তখনই চোখের সামনে ভেসে ওঠে 'খাইবার' জাহাজ, জল কেটে এগিয়ে চলেছে। বয়লারে কয়লা ঠেলছে নাবিকের দল। সগর্জনে কামানগুলো গোলাবর্ষণ করে যাচ্ছে। অথবা মনে পড়ে 'অঙ্গার' নাটকের শেষ দৃশ্য, যেখানে কয়লার খনিতে জল ঢুকছে। ভারতীয় থিয়েটারের পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত দুটি নাটকই ছিল অত্যন্ত

বলিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রযোজনা। অথচ নাটকের মূলে বক্তব্য কোথায় যেন হারিয়ে গেল বৈজ্ঞানিক আলোর মারপ্যাঁচে। 'অঙ্গার'-এর শেষ দৃশ্যের খাদে জল ঢোকাটা মনে পড়ে অথচ সেই মুহূর্তের শ্রমিকের আর্ত চিৎকারটা আমাকে বই দেখে পড়ে নিতে হয়। যেমনটি হয় 'কল্লোল'-এ শার্দুল সিং-এর 'নো সারেণ্ডার' কথাটা মনে করতে গিয়ে।

সেই থেকে শুরু হয়েছে খোঁজার পালা—কী ভাবে বলা উচিত। বারবার মনে হয়েছে আমাদের সততা ও আন্তরিকতায় কোনও ফাঁকি নেই, শুধু জানি না কীভাবে কমিউনিকেট করতে হয়। যে গতানুগতিক ধারায় আমরা কাজ করছিলাম, তার আবিষ্কর্তা আমরা নই, আমাদের এক ফোঁটা অন্বেষণের পরিশ্রম নেই এর মধ্যে, দুশো বছরের সাদা চামড়ার প্রভুদের থেকে তা আমরা দেখে শিখেছি মাত্র। এ সময়টা অবধি আমার ধারণা ছিল নাটক করতে গেলে প্রয়োজন হয় তিনটি জিনিসের, প্রথমত, ভাল অভিনয়-ক্ষমতা, দ্বিতীয়ত, অসম্ভব ভাল কোরিওগ্রাফির জ্ঞান আর তৃতীয়ত, সাংগঠনিক ক্ষমতা। কিন্তু কাজের মধ্যে অনুকরণের ঝোঁক কীভাবে কাটিয়ে তুলব তা আমাদের জানা ছিল না। 'অনুকরণ মাত্রই দোষণীয়' না হলেও অনুকরণবৃত্তির সঙ্গে সৃষ্টিশীলতার কোনও সম্পর্ক নেই।

চোখ কান খোলা রেখে আরও সজাগ হলাম, চারপাশে আরও সচেতন দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে শুরু করলাম। দেখলাম আমাদের চারপাশে সর্বত্রই রয়েছে থিয়েটারের এক মহা আয়োজন, পারিপার্শ্বিক জগতের মধ্যেই লুকিয়ে আছে থিয়েটারের এক আশ্চর্য জগত। একটা অভিজ্ঞতার গল্প বলি। আটাত্তর সালের মে মাসের একদিন বিকেলবেলায় গিয়ে পড়লাম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের দামোদরের পাশে ছোট্ট এক গ্রাম বীরভানপুরে। নদীর ওপারে রুখু বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষের দিকচক্রবাল। বালির চড়ায় প্রায় পঞ্চাশ ফিট উঁচু এক ঢড়কের কাঠ, তার ওপরে আড়াআড়িভাবে আরেকটা লম্বা কাঠ চরকির মতো করে বসানো। আড়াআড়ি কাঠটার একপ্রান্তে ঝোলানো রয়েছে লম্বা একটি দড়ি, অন্যপ্রান্তে দড়িতে বাঁধা আছে বঁড়শির মতো বাঁকানো ভারি একটা লোহার হুক। আশেপাশে নানান গ্রাম থেকে আসা মানুষের ভিড়। এবার ভক্ত এলেন। খালি গা, নতুন একটা ধুতি মালকোচা দিয়ে পরা, একটা গামছাকে পাকিয়ে শক্ত দড়ির মতো করে বুকে বাঁধা। সবার দিকে ঘুরে ঘুরে দেখে হাতজোড় করে নমস্কার করলেন। বীর শহিদের মতো ঋজু, বিনম্র তার চলাফেরা। চড়ক কাঠে প্রণাম করে আবার সবার দিকে তাকালেন। এবার আমার সঙ্গে চোখাচোখি হল, সেই এক নিষ্পলক মুহূর্তে তিনি যেন অনেক কথাই বললেন। হয়ত যার সঙ্গেই চোখাচোখি হল, এইভাবে কথা বলে চললেন। চক্রাকারে ঘুরে এসে শান্ত হয়ে দাঁড়ালেন হুক বাঁধা দড়িটির নিচে, সহযোগীরা এগিয়ে এসে লোহার সুতীক্ষ্ণ হুকটা বঁড়শিতে মাছ গাঁথার মতো ফুটিয়ে আটকে দিলেন তার পিঠে। টপটপ করে রক্ত ঝরতে থাকল তার গাঢ় বাদামি রঙের চামড়া বেয়ে। দু-এক ফোঁটা ঝরে পড়ল সাহারার মতো তপ্ত মাটিতে, তিনি কিন্তু নির্বিকার। অপাঙ্গে একবার রক্তের ফোঁটার দিকে তাকিয়ে মাথা উঁচু করে চড়ক

কাঠের শীর্ষে একবার তাকালেন। ওই অবস্থায় ওকে টেনে তোলা হল মাটি থেকে প্রায় চল্লিশ ফুট ওপরে। ক্রেনের হুকে আটকানো ভারি বস্তার মতো তাঁর দেহ নিরালম্ব হয়ে ঝুলছে। সহযোগীরা আড়কাঠির অপরপ্রান্তের দড়ি হাতে নিলেন এবং ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ঘোরাতে শুরু করলেন প্রথমে আস্তে, তারপর জোরে, আরও জোরে। ঘোরার সঙ্গে একটা তাল, ছন্দ যুক্ত হল। ঘূর্ণনের নিয়ম অনুযায়ী তিনি তখন আড়কাঠের প্রায় সমন্তরাল রেখায়, ওই অবস্থায় কোঁচড় থেকে খুলে নিলেন ফুল আর বাতাসা। এক হাতে মুখ চাপড়ে প্রাণপণে 'আ-ও-য়া, আ-ও-য়া' আওয়াজ তুললেন, অন্য হাতে ছুঁড়তে থাকলেন আমাদের দিকে সেই ফুল আর বাতাসা। এবারে ঠায় রোদে প্রায় এক ঠোঙা বকের মতো দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো পাগলের মতো কুড়োতে শুরু করল সেগুলো। হঠাৎ আমি আবিষ্কার করলাম, আমি নিজে সেই ধুলোর মধ্যে হাতে এক খাবলা মাটির মধ্যে ভাঙা এক টুকরো বাতাসা ধরে আছি। জনতা এবারে শান্ত হল। ভক্তকে এবার নামানো হচ্ছে, মাটিতে তার পা ঠেকল, কোনও সাহায্যের দরকার হল না নিজের পায়ে দাঁড়াতে। হুক খুলে নেওয়া হল তার পিঠ থেকে। সবার দিকে জোড়হাত করে আবার তাকালেন, মুখে তার এক অনির্বচনীয় আনন্দ ক্লান্তির কোনও ছাপ নেই। নেই কোনও কষ্টের বা ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার ছাপ। এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার স্বাদ নিয়ে শুরু করলাম ফেরার পালা। সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত এই মহান থিয়েটারের অভিজ্ঞতা মুহূর্তে আমার সকল রক্ত কোষকে হিটারের মতো উত্তপ্ত করে তোলে, আমার মস্তিষ্কের নার্ভগুলোকে ইলেকট্রিক শক দেয়। অথচ এখনও পর্যন্ত 'ঈশ্বরের' ওপর আমার এতটুকু আস্থা নেই, তার অস্তিত্বকেই আমি প্রবলভাবে অস্বীকার করি। তা হলে কী হয়েছিল? কেনই বা একে মহান থিয়েটারের আখ্যা দিলাম? ব্যাখ্যাটি আমার কাছে এরকম: ওই ভক্ত আসলে একজন বড় অভিনেতা। অভিনেতা বলতেই মনে কোনও ধন্দ আনবেন না। ভেবে নেবেন না লোকগুলো খালি 'হয়' কে 'নয়' করে আর 'নয়' কে 'হয়' করে। আসলে খাঁটি অভিনেতারা 'হয়' কে 'হয়ই' করেন আর 'নয়' কে 'নয়ই' করেন। তিনি ছিলেন তেমনই শক্তিমান একজন অভিনেতা। শক্তিমান কেন? কারণ প্রথমত, তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছেন, তিনি অ্যাকশন করেছেন। ভারবালি ও নন-ভারবালি কমিউনিকেট দ্বিতীয়ত, ভাষা দিয়ে কিংবা ভাষা ছাড়াই কমিউনিকেট করেছেন। বিষয় যাইহোক না কেন।

এবার এই তিনটে বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। তিনি নিজেকে কী ভাবে প্রস্তুত করলেন? একমাস কঠিন সংযমের মধ্যে শরীর এবং মনকে গড়েছেন এই বিশেষ দিনের অভিনয়ের জন্য। ধর্মীয় দিক থেকে তিনি বিশ্বাস করেন যে সংযমে এতটুকু অবহেলা হলে তিনি সফল হবেন না। তাই তাঁর এই একমাসের অনুশীলনে কঠিন সংযমের ভিতর দিয়ে, পূর্ণবিশ্বাসে তাঁর আরাধ্য দেবতাকে নিত্য নতুনভাবে নানা উদ্ভাবনী পদ্ধতিতে পুজো করে নিজে আবরণ মুক্ত হতে চেয়েছেন। এবার অভিনয়ের দিনে সমবেত জনতার সামনে হাজির হয়ে করজোড়ে অভিবাদন জানানোটা হল তাঁর

দেবতার কাছে আত্মসমর্পণ। জনতার মধ্যে তিনি তাঁর দেবতাকে দেখতে পান কারণ তাঁর বিশ্বাস 'জীবের মধ্যে শিব' বর্তমান। পিঠে হুক ফুটিয়ে তার 'সেলফ-পেনিট্রেশন' পর্ব চূড়ান্ত হল। এর মধ্যে সবার দিকে তাকিয়ে 'নন-ভারবাল কমিউনিকেশন' করার চেষ্টা করেছেন। তাঁকে হুকবিদ্ধ অবস্থায় তোলা হল শূন্যে, শুরু হল ঘূর্ণন, অর্থাৎ 'অ্যাকশন' পর্বের সূচনা হল। তারপরে চিৎকার আর ফুল-বাতাসা ছোঁড়ার পর্যায়টিকে বলা যেতে পারে: অ্যাকশন উইথ প্রপার্টিজ উইথ ভারবাল কমিউনিকেশন। সমবেত জনতা কমিউনিকেটেড হয়ে ফুল আর বাতাসা কুড়োতে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তিনি অহঙ্কার-বর্জিত এক শিশুর মতো নেমে এলেন।

তত্ত্বের ভাষায় উপরের ঘটনাটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে: 'if you want to communicate, you have to sanctify yourself, and then through self-penetration you have to prepare to sacrifice yourself to the audience. That is how one learns to overcome one's ego, and discovers a child-like quality in oneself, and can demand the affection that a child calls forth so naturaly. If an actor can hold on to this child-like quality throughout his presentation, he will be able to communicate in both verbal and non-verbal ways with a audience all through'.

লোকশিল্প এবং লোকাচারের ঐতিহ্যের মধ্যে অনেক উপাদান আছে যা 'কমিউনিকেটিভ ফ্যাকটর' হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে শুরু করলাম অতীত-সন্ধান—'লুক-ব্যাক'। চোখে পড়ল সিংভূমে, পুরুলিয়ায় রুখু-শুখু পাথুরে মাটির ওপর ঘামের ফোঁটা; শাল-পিয়াল-মহুয়ার বনে শুনলাম ধামসার বুক কাঁপানো শব্দ আর সুবর্ণরেখার কান্না-ভেজা তারসানাইয়ে 'ঝুমুর'-এর সুর। দেখলাম অনবদ্য ছো-নাচ, প্রায় দশ কেজি ওজনের মুখোশ পরে আদুর গায়ে ধামসা আর ঢোলের তালে পাথরে পা ফাটিয়ে চলেছে যুদ্ধ—কখনও অসুরের সঙ্গে দুর্গার, কখনও অভিমন্যুর সঙ্গে সপ্তরথীর কিংবা কিরাতের সঙ্গে অর্জুনের। সে যুদ্ধ যেমন তাদের নাচে, তেমনি তাদের জীবনেও।

মাটির দেওয়ালে খড়ের চাল, চাঁদের আলোর উঁকিঝুঁকি ঘরের ভিতরে। পোড়া দেশে খরা দুর্ভিক্ষের সঙ্গে যত সাক্ষাৎকার তার একাংশও হয় না মেঘ-বৃষ্টির সঙ্গে। রক্ত ঝরিয়ে মাটি নরম করে পাহাড়ের ওপর ফলায় কয়েক আঁটি ধান আর জোয়ার, মাত্র কয়েক মাসের অন্ন সংস্থান হয় তাতে। বাকি সময় জঙ্গলের শাক-পাতা কচু খুঁটে খাওয়া অথবা শহুরে ইট-ভাটায় মজদুরি, নয়তো বাবুদের বাগানে জল তোলা। এ হেন মানুষেরা নাচে। সে নাচের দাপটে অযোধ্যার মতো পাহাড় কাঁপে, চান্দিলের মতো ডুংরি থরথরায়। দলমার ওপারে থমকে দাঁড়ায় হাতির পাল, জামসেদজী টাটার বয়লার চোখ লাল করে আকাশের দিকে তাকায়। নাচ এদের রক্তে, পূর্বপুরুষেরা ছিল যোদ্ধা, যুদ্ধ এখন পরিবর্তিত হয়েছে নাচে। শিব যদি সন্তুষ্ট হন, জমিতে ফসল ফলবে, তাঁকে

সন্তুষ্ট করতে রাতের পর রাত চলে রাত-জাগা নাচ 'ছো'। কোনও নৃতাত্ত্বিক আলোচনার খাতিরে এত কথা বলা নয়। যে মানুষগুলো বেঁচে থাকে দারিদ্রসীমার অনেক নিচে তারা কয়েক মাস ধরে রাতের পর রাত নাচে কীভাবে? পুরুলিয়া, আনাইবাদ, জামডি নিমডি, ইছাডি, পটমদা, চোড়দা ইত্যাদি জায়গায় ঘুরে ঘুরে দেখলাম প্রকৃতির এমনই এক বিচিত্র কান্ডকারখানা। সর্বত্রই সেই বীরভানপুরের অভিজ্ঞতা—সেই প্রস্তুতি, সমর্পণ, আত্ম-নিপীড়ন ও নিরহংকার কমিউনিকেশন। উপবাসী শরীরগুলোই শক্তির উৎস হয়ে উঠছে। নাচের বিভিন্ন মুদ্রায় তারা দেহকে অচেতনে, অজান্তে এমনভাবে ব্যবহার করে যাতে শরীর 'ফ্লুয়িড অব এনার্জি'তে ভরপুর হয়ে যায়। গোটা শরীরটা 'চার্জড' হয়ে যায়। এইভাবে [সেলফ-পেনিট্রেশন' এর ফলে] শরীরের একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটে যায় এবং শরীর তখন কমিউনিকেট করতে শুরু করে। এই অবস্থায় শরীর এত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে যে শূন্যে লাফ দিয়ে ঘুরে হাঁটু গেড়ে সটান মাটিতে পড়েই আবার উল্টে কোনওরকম ভর না দিয়ে একটা ডিগবাজি খায়। এইভাবে একটা-দুটো নয়, পরপর চব্বিশটা লাফ মারতে দেখেছি ওই না খেতে পাওয়া 'সিং', 'কুমার' নাচিয়েদের।

পৃথিবীর নানা প্রান্তের নানা ধরনের নাচ দেখলাম। কোনারক শিল্পভাস্কর্যের ওড়িশি; দক্ষিণের কালারি, কথাকলি, ভারতনাটাম, বাংলার রায়বেশে; মণিপুরের রাস, কাবুই-নাগা, থাংতা; মেক্সিকান ভুডু; জাপানি কাবুকি, নো; 'সাগর জলে সিনান করি সজল এলো চুলে'র দেশ বালি দ্বীপের তোপেং লেগং আরও কত। সব নাচেরই আদত ভঙ্গিনাগুলোর মধ্যে অদ্ভুত কতগুলো সাদৃশ্য আছে। পরে প্রকাশভঙ্গির বিভিন্নতায় অন্যরকম হয়ে যায়। কোথাও পেলব, কোথাও ঋজু, কোথাও শান্ত, কোথাও রুদ্র, কোথাও অন্তর্লীন, কোথাও বা বহির্মুখি—কিন্তু শক্তির উৎস ও তার ব্যবহারে প্রতিটি নাচের মধ্যেই যেন কোনও না কোনও মিল লক্ষ করা যায়। এইসব নৃত্যশিল্পীদের শ্বাস-প্রশ্বাসের পদ্ধতিটিও শিক্ষণীয় বিষয়। শরীরে অক্সিজেন সরবরাহের উপর নির্ভর করে আমাদের প্রাণশক্তি। স্নায়ুতন্ত্র সতেজ হয়ে ওঠে। বিভিন্ন প্রকার হরমোনের যথাযথ ক্ষরণের ফলে মন হয়ে ওঠে সহজ, প্রাণবন্ত ও স্বাভাবিক যে কারণে অতি সহজেই তখন ফিরে পাওয়া সম্ভব শিশুসুলভ মেজাজ, ধর্ম।

নৃত্যশিল্পীকে লক্ষ করুন। কী অসাধারণ সারল্য তাঁর মুখে, কী বিনীত তাঁর ব্যবহার! তাঁর বেশির ভাগ কথাই তাঁর ভঙ্গিমায়, তাঁর নাচে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ সবটাই তার নন-ভারবাল কমিউনিকেশন। শব্দের যেমন তরঙ্গ আছে, তেমনি নৈঃশব্দেরও একটা তরঙ্গ আছে। নৈঃশব্দ শূন্যতা নয়, কমিউনিকেশনের বা কিছু বলতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে সে ধারণ করে আছে। শব্দের মতো চিন্তাও তরঙ্গের সৃষ্টি করে: 'Thought vibrations last longer, travel faster, remain longer. In other words, 'the voice of mind' is far superior in power to the voice of mouth.' কাউকে ভালবাসা বা শ্রদ্ধা

জানাতে চিৎকৃত ঘোষণায় বলার দরকার হয় না, 'আমি আপনাকে ভালবাসি, আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি।' আমার এই কথাটা জানাবার আকাঙ্ক্ষা চোখের ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে, শুধুমাত্র শরীরের একটি ছোট্ট ভঙ্গিতে আরও বেশি প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে যা বুঝতে এক মুহূর্তও সময় লাগবে না। স্টেশনে বা এয়ারপোর্টে কেউ বিদায় জানাতে এলে তার চোখের দৃষ্টি আর দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিমায় আপনি যেভাবে নীরবতার ভাষা পড়ে নিতে পারেন, অনুভব করেন কেমন স্বচ্ছ হয়ে এল তার সঙ্গে আপনার সম্পর্কের গভীরতা।

নির্মাণ পর্ব

গতানুগতিকতার বাইরে যে থিয়েটারকে অন্বেষণ করা শুরু হল, সেখানে শরীরই কথা বলে। কিন্তু দেখা গেল যে শরীর যে শব্দ, যে চিন্তা ও মনন নিয়ে থিয়েটার করতে আসা তার সবটাই সমাজব্যবস্থা থেকে উত্তরসূরী হিসাবে পাওয়া কতকগুলো ধারণার দাসত্ব করে চলেছে। যেভাবেই শরীর দিয়ে বোঝাতে চাই না কেন, কোথাও না কোথাও তা কতগুলো বদ্ধমূল ধারণার দ্বারা প্রভাবিত বা কণ্ডিশনড হয়ে পড়েছে। ফলে শরীরযন্ত্রকে ব্যবহার করেও নতুন কথাগুলো আর বলা হয়ে উঠছে না। তখনই ধারণার দাসত্ব থেকে মুক্তির প্রয়োজন দেখা দিল অর্থাৎ কণ্ডিশনকে ভেঙে ডিকণ্ডিশনিং করার উপায় খুঁজতে হল। কিন্তু এই ডিকণ্ডিশনিং করার পদ্ধতি কী হবে? শুরু হল শিকড়ের সন্ধান—লোকসংস্কৃতির সুবিশাল ঐতিহ্যের মধ্যে যে উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে তার দিকে ফিরে তাকানোর পালা। দীর্ঘসূত্রতার পথ ধরে, নানা অনুশীলনের পর্যায়ক্রমে লোকসংস্কৃতিতে এক একটা ঐতিহ্যের আকার গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন পরম্পরায় পুরনো দিনের মানুষেরা একটা যোগাযোগের ভাষা গড়ে তুলেছিলেন, লোকাচারে, লোক-অনুষ্ঠানে বিমূর্ত ভাবনায় কতগুলো কথাকে তাঁরা ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন। বোঝানোর এই ধরন আজকের দিনে হয়ত ব্যাতিল বলে গণ্য করা হবে কিন্তু মনে হয় প্রকৃত অনুসন্ধানের ফলে তার মধ্যে কমিউনিকেশনের এমন কিছু জীবন্ত উপাদান খুঁজে পাওয়া যাবে যেগুলো আধুনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও নতুনভাবে ব্যবহার করা সম্ভব। সামান্য পরিবর্তন সাপেক্ষে তার থেকে একটা নতুন ফর্ম তৈরি করা যায়। কাজ শুরু করা গেল। দলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমরা কয়েকদিন ছো-নাচের প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে ছো-নাচ ব্যাপারটা কী তা বোঝার চেষ্টা করি এবং সেটা ভালভাবে অভ্যাস করতে থাকি। এই প্রশিক্ষণের এক একটা পর্যায়ে ছো প্রশিক্ষক গুরুর কাছে তালিম নিয়ে আবার নিজেরা অনুশীলন করি। তারপরে ছেলেমেয়েদের বলি আপাতত ছো-নাচের ব্যাপারটা ভুলে যেতে। এই সময় আমরা অন্যান্য কাজ যেমন অন্যান্য নাচ শিখতে চেষ্টা করি। কিছুদিন পরে, দলের সবাইকে যখন আবার ছো-নাচ নাচতে বলা হল, অভিনেতারা একটু অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে পড়লেন। পুরো ছো-নাচটা তারা কিছুতেই মনে করতে পারছিলেন না। কিন্তু তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করলে

ওই অবস্থাতেই তারা নাচটা শুরু করেন এবং যে জায়গাগুলো মনে করতে পারছিলেন না, সেখানে নিজেরাই এমন কতগুলো ভঙ্গি দিয়ে ভরাট করতে থাকেন, যার সঙ্গে আসল ফর্মের একটা সাযুজ্য থেকে যায়। এইভাবে আমরা ছোট ছোট করে ইমপ্রোভাইজ করতে আরম্ভ করি। কতগুলো বিষয়বস্তু বেছে নিয়ে তার ওপর কাজ করতে থাকি। দেখা গেল, খুব আস্তে আস্তে মনের অজান্তেই অভিনেতাদের মাথায় প্রথমে যে ফর্ম বা নাচটা ছিল, সেটা তাদের শরীরের মধ্যে চলে এসেছে। শরীর তখন নিজেই পরোক্ষভাবে কোনও কোনও কাজের মধ্যে সেই ফর্ম-এর বিকাশ ঘটিয়ে চলেছে এবং তার ফলে শরীর অন্যভাবে এক শক্তি তরঙ্গে ভরপুর হয়ে একটা নতুন ফর্মকে ফুটিয়ে তুলছে যাকে আর ছো-নাচ হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। একে শুধুমাত্র সেই অভিনেতার নিজস্ব ফর্ম বলা যেতে পারে যা কখনওই যৌথ নয় কারণ ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যেক অভিনেতার দেহের গঠন, মন, চিন্তাধারা, অনুভূতি ও অংশগ্রহণের মনোবৃত্তি এ সবই আলাদা রকমের হয়ে থাকে। প্রত্যেকেই নিজের মতো করে কাজটা তৈরি করে একটা নিজস্ব ফর্ম সৃষ্টি করতে থাকেন। শরীরের মধ্যে যখন কেউ এই ধর্মকে খুঁজে পায় তখনই তিনি সম্পূর্ণ অভিনেতা হয়ে ওঠার দিকে এগিয়ে যান। পরবর্তী জীবনে এই অভিনেতারাই আমাদের নাটকে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেন।

থিয়েটারে আমরা চরিত্র চিত্রণ করি না। সুতরাং, ব্যক্তি অভিনেতার গুরুত্ব আমাদের থিয়েটারে কম, বরং যৌথ অভিনয়ের উপর অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। কোনোও ব্যক্তি অভিনেতার চেহারা, কণ্ঠস্বর বা অভিনয়ের থেকে দলগত অভিনয়ের প্রভাব বা গুরুত্বই আমাদের থিয়েটারে বেশি। নাটকের স্ক্রিপ্টও তৈরি হয় যৌথভাবে, নাটক তৈরির সময়ে সকলের ভাবনা ও মতামতকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। একনায়কত্ব ব্যাপারটা আমাদের নাটকে একেবারেই নেই। তবে একটা নিয়ন্ত্রণ না থাকলে কাজও করা যায় না। কারণ আমি যেভাবে ব্যাপরটা ভাবতে চাইছি যদিও সবাইকে ব্যাপারটা ভাবাচ্ছি, তবুও তার মধ্যে দিয়ে যতক্ষণ না আমার ইমেজটাতে স্যাটিসফ্যাকশন পাচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত থামতে পারি না। আমি বলি, আমার ভূমিকাটা হচ্ছে একজন মালাকারের মতো, আমার অভিনেতারা ফুল কুড়িয়ে নিয়ে আসে। তারা যেমন ফুল আসবে, আমি তেমন মালা বানাতে পারি। আমার মালাটা নির্ভর করে আমার অভিনেতার ওপরে। তারা যদি বাসি পচা ফুল নিয়ে আসে তবে সেরকম মালা হবে, আর টাটকা, সতেজ, সুগন্ধি ফুল নিয়ে এলে সুন্দর, মালা হবে। 'অহল্যা'-র ক্ষেত্রে বোধহয় সেরকম ব্যাপারটা ঘটেছিল, খুব ভাল ফুল সংগ্রহ করা গিয়েছিল। আবার যেসব নাটকে আমি ব্যর্থ হই, তাও আমার একার দোষ নয়, আমার অভিনেতারা আমাকে সেরকম ভাল ফুল দিতে পারে না। আমি শুধু কাজটা করার নির্দেশ দিই—এই ফুলটা এখানে রাখ, ওই ফুলটা ওখানে রাখ, এখানটা একটু মোটা কর, ওখানটা একটু সরু কর ইত্যাদি, এর বেশি আমার ক্ষমতা নেই। এবং এই কাজটি, অর্থাৎ এই পরামর্শ বা নির্দেশ যাই বলুন না কেন সেখানে আমি ভুল করলে গ্রুপের সদস্যরা সংশোধন করে

দেন। এই থিয়েটার কেবল নির্দেশকের নয়, কেবল অভিনেতার নয়। এ হল যথার্থ যৌথ শিল্প।

গল্পের গণ্ডি পেরিয়ে

আমাদের গোড়ার দিকের থিয়েটারগুলোর সঙ্গে আজকের থিয়েটারের অনেকটা ফারাক হয়ে গেছে। আগেকার নাটকের মধ্যে যে গল্প-নির্ভরতা ছিল, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আমরা তার থেকে অনেকটা বেরিয়ে এসেছি। আধুনিক সাহিত্যেও এখনও টানা, মসৃণ গল্প বলা বর্জন করেছেন লেখকরা। অথচ থিয়েটারের কাঁধ থেকে সে ভূত আজও নামল না। মনে হয়, যোগাযোগের মূল জায়গাটা হল অ্যাবস্ট্রাকশন বা বিমূর্তিকরণ। বিমূর্ততার স্তরে আঘাত না করলে আমরা কিছুতেই সফল হব না। প্রশ্ন হল : এই বিমূর্ততার স্তরটা কী ? এর ব্যাকরণগত ব্যাখ্যা অনেক থাকতে পারে কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে বোঝাবার জন্য যেভাবে আমরা ব্যাখ্যা করি সেভাবেই বলা যাক। একটা গোলাপ ফুল কাউকে দেখানো হলে সে পাপড়ির রঙ, গন্ধ, রূপ, ফুলটা টাটকা না বাসি তা বিচার করতে বসে, কিন্তু একটা গোলাপের বাগানের সামনে তাকে নিয়ে গেলে আলাদা-ভাবে রঙ-রূপ-গন্ধের বিচার সে করতে পারে না, তার মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে আসে : 'বাঃ'। একেই বলব সৌন্দর্যের বিমূর্তিকরণ। একটা গোলাপ দেখে যে খুঁটিয়ে বিচার তা প্রসেনিয়াসের ক্ষেত্রেই সম্ভব, আমাদের থিয়েটারের ক্ষেত্রে তা একেবারেই সম্ভব নয়। বিমূর্তিকরণের এই জায়গাতেই আমরা আসতে চাই।

প্রাচীনকালে মুনিঋষিরা হিন্দুধর্মে পরমব্রহ্ম বা পরমাত্মা লাভের কথা বলে গিয়েছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে সাধারণ মানুষ সরাসরি এই পরমজ্ঞান বা পরমাত্মা লাভ করতে পারবে না, বা বিমূর্ততার স্তরে পৌঁছতে পারবে না। সুতরাং সাধারণ মানুষের হাতে কিছু উপকরণ যেমন—একটা কালী, একটা কৃষ্ণ বা দুর্গা ইত্যাদি তুলে দেওয়া হল। এই মাধ্যমগুলোর সাহায্যেই চলল পরমাত্মার সাধনা। কিন্তু কালের গতিতে পরমব্রহ্ম থেকে মানুষ সরে এসেছে, রয়ে গেছে শুধু উপকরণগুলো। ধর্মের মূল থেকে সরে এসে একটা কালীঘাট, একটা দক্ষিণেশ্বর অথবা একটা শনিমন্দিরে আমরা মাথা ঠুকে চলেছি, পরমব্রহ্মকে আর পাওয়া হল না। ইসলাম অবশ্য এ ব্যাপারে হিন্দু ধর্মের থেকে খানিকটা এগিয়ে রয়েছে। এই ধর্মে প্রথমদিকে আল্লা, ওজ্জা, বিভিন্ন দেবদেবীরা ছিলেন। কিন্তু হজরত মহম্মদ মূল ব্যাপারটা অনুভব করতে পেরে সমস্ত মূর্তি বর্জন করতে বললেন। আল্লার সাধনা নিরাকারের সাধনা, অর্থাৎ হিন্দুধর্মের পরমব্রহ্মের মতোই এক পরম প্রাপ্তি। মসজিদে ঢুকলে আমরা কোনও মূর্তি বা ছবি—এমন কি হজরত মহম্মদের ছবি বা মূর্তিও দেখতে পাব না। মুসলিমদের ধর্ম-ভাবনার কেন্দ্রে ওই একটিই শব্দ—'আল্লাহ'। বলা যেতে পারে যে তারা কিছুটা বিমূর্ত স্তরে পৌঁছতে পেরেছে। থিয়েটারের দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণা, আশা, আকাঙ্ক্ষা এ সবই বিমূর্ত বিষয়। বিমূর্ততার স্তরে পৌঁছনোর চাহিদা মেটাতেই

আমদানি করা হয়েছিল নানা উপকরণ—আলো, মেক-আপ, মঞ্চসজ্জা, সাজপোশাক, সংলাপ, গল্প ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানে থিয়াটারে বিমূর্ততার বিলুপ্তি ঘটেছে, থিয়েটারে মূল বক্তব্যকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি। 'কল্লোল' বা 'অংগার' নাটকে বার্তা কী—আমার মনে পড়ে না। কিন্তু 'অংগার' বললেই চোখের সামনে রাতে খনিকে জল ঢোকার ছবি ভেসে ওঠে বা 'কল্লোল' বললেই জাহাজটা দেখতে পাই। অর্থাৎ আমরা কালীঘাট বা দক্ষিণেশ্বরেই রয়ে গেলাম, মূল জায়গাটায় পৌঁছতে পারলাম না। আলোর সাহায্যে আমরা যত সুন্দরভাবেই স্টেজে আগুন তৈরি করি না কেন, বা মেক-আপ এর সাহায্যে বৃদ্ধ সাজাইনা কেন, দর্শক কিন্তু একবারও তাকে সত্যি আগুন বা বৃদ্ধ হিসাবে বিশ্বাস করে না, অর্থাৎ দর্শককে ঠকানো গেল না। এইভাবে উপকরণ-নির্ভরতা থিয়েটারে বিমূর্ত স্তরে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। থিয়েটারের বার্তা নিয়ে বিমূর্ততার স্তরে সংযোগ স্থাপন করার তাগিদেই উপকরণগুলোকে ভাঙার প্রয়োজন দেখা দিল। প্রসেনিয়াম মঞ্চ, আলো, সাজপোশাক, মঞ্চসজ্জা ইত্যাদি বর্জন করতে আরম্ভ করলাম। এই বর্জনের পথে চলা শুরু করেও যে জায়গায় এসে অসুবিধেয় পড়তে হয় তা হল থিয়াটারের প্রচলিত গল্প গোলানো পদ্ধতি বা একটি গল্পের বিন্যাসের মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাওয়ার রীতি। এই সমাজ ব্যবস্থায় যে থিয়েটারগুলো তৈরি হচ্ছে তার অধিকাংশেই সিনমো বা টেলিভিশনকে অনুকরণ করার করার এক ধরনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এ কথা বলা যেতে পারে যে তারা সিনেমা বা টেলিভিশনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে চাইছে। বা অন্যভাবে বলা যায় ফিল্ম যখন বাস্তবকে হুবহু বাস্তব হিসাবে তুলে ধরছে তখন মঞ্চের ওই বাক্সবন্দী থিয়েটারের তো প্রয়োজনই ফুরিয়ে যায়। তার এই প্রতিযোগিতা তাই মৃত্যুর পথেই এগিয়ে চলা। মাধ্যম হিসাবে সিনেমা বা টেলিভিশনের ক্ষমতা সুদূরবিস্তৃত সীমিত ক্ষমতা নিয়ে থিয়েটার তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। যে ভাবে সিনেমার দৃশ্যে আগুন দেখানো হয় থিয়েটারে কিন্তু তা সম্ভব নয়। এই সীমাবদ্ধতা বুঝেই আমাদের থিয়েটারের কাজ করতে হবে। এই যে আমরা গল্পের চৌহদ্দি পেরোতে পারছি না বা গল্পের চেহারাকে ভাঙতে পারছি না তার মূলেও রয়েছে চলতি সিনেমার প্রভাব। অথচ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের আধুনিক ছবিগুলোয় দেখা যাবে যে তাঁরা বিমূর্ততার গভীর স্তরে কাজ করেছেন—সে সব ছবির গপপো কাউকে শোনানো যায় না কিন্তু ছবি দেখার পর মনের মধ্যে এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটতে থাকে যা কাউকে বলা যায় না, বোঝানো যায় না। বিমূর্ততার দিকে যাত্রার পথে বাধা সৃষ্টি করছে এই গল্প। তাই গল্পকে ভাঙার চেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। "অহল্যা" নাটকে সরাসরিভাবে কোনো গল্প না থাকলেও কোনও-কোনও সময়ে নাটকটা গল্পের বৃত্তের মধ্যে ঢুকে পড়তে চেয়েছে। কিন্তু 'কালো বস্তি'তে সম্পূর্ণভাবে গল্পকে বর্জন করতে আমরা সফল হয়েছি। কবিতা নিয়ে কাজ করার ফলে গল্পের রাস্তা আপনা থেকেই আবছা হয়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে কবিতার বিষয় বস্তু নয়, তার ইমেজটাই থিয়েটারে প্রাধান্য পেয়েছে। কবিতার মধ্যে একাধিক ইমেজ লুকোনো

থাকতে পারে। সেগুলো নিয়ে কীভাবে কাজ করা যায় তা দেখতে হবে। বলা যেতে পারে যে কবিতা থেকে কবিতা-কবিতা ভাবটা সরিয়ে দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই আমাদের থিয়েটারের উপকরণ হতে পারে। শেষপর্যন্ত কবিতা আর রইল না, সম্পূর্ণ একটা থিয়েটার তৈরি হল। যেমন "কালো বিস্ত" নাটকে আমি "কালো বিস্তর পাঁচালী" কবিতাটা একেবারেই ব্যবহার করিনি। বার বার কবিতাটা পড়ে মনে মনে চিন্তা করার পর আমার ভিতরে যে কতগুলো ছবি তৈরি হয়েছিল, অভিনেতাদের সাহায্যে তারই পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। অর্থাৎ ইমেজগুলোই নাটক হয়ে উঠেছে। "কালো বিস্ত"-র অভিনয়ের পর বহু সাধারণ, নিচু তলার মানুষের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। নাটক বুঝেছেন কিনা জানতে চাইলে তাঁরা উত্তর দিয়েছেন : 'কী জানি কিছু বুঝতে পেরেছি কিনা, কিন্তু যখন দেখছিলাম, ভিতর থেকে শুধু কান্না ঠেলে ঠেলে আসছিল, মনে হচ্ছিল এতো আমাদেরই কথা, আমাদের দুঃখ-কষ্টের কথা'।

থিয়েটার কতগুলো এলিমেন্ট এর উপরে নির্ভরশীল হতে পারে, তার থেকে সাহায্যও পেতে পারে কিন্তু থিয়েটার বলতে সেই এলিমেন্টগুলোকে বোঝায় না। থিয়েটারের স্থান আরও উপরে। বাউলের পোশাক, কণ্ঠী, বৈষ্ণবী আর গাঁজায় নয়, ভাব লুকিয়ে আছে তার গানের মর্মকথায় 'ওরে মন রে'। কৃষ্ণ নয়, কালী নয়, শিব নয়, শুধু 'মন', আমার 'অধরা মন', আমার ভিতরের মন। আমার 'আমি'। এ সাধনায় যোগ দিতে চাই এক্ষুণি, কারণ 'বারে বারে আর আসা হবে না'। 'Celebration, Theatre is a Celebration, even if it is sorrow. And Theatre is Life and Life is Theatre, the Living Theatre, the name of search, a Continuous search'. সীমাবদ্ধতা ভেঙে থিয়েটারের নতুন সংজ্ঞা খুঁজতে চাইছি, কিন্তু সে সংজ্ঞাও প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। আজ যেভাবে থিয়েটারকে বুঝছি, কাল সেভাবে না বুঝে অন্যভাবে বুঝতে পারি। আমার যদি মনে হয় এই ফর্মটা ঠিক হচ্ছে না, তাহলে আমি হয়ত তা পাল্টে ফেলব। এ এক খোঁজার শুরুমাত্র। ফর্ম-সংক্রান্ত প্রশ্নে আমরা নিজেরাই নিজেদের সমালোচক, প্রতিমুহূর্তে নিজেদের চ্যালেঞ্জ করি। থিয়েটারের মধ্যে থেকে প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে প্রত্যেকে নিজেকে আবিষ্কার করতে থাকি। এই আবিষ্কারের মধ্যেই মহৎ থিয়েটারের অর্থ খুঁজে পাই আমরা। □